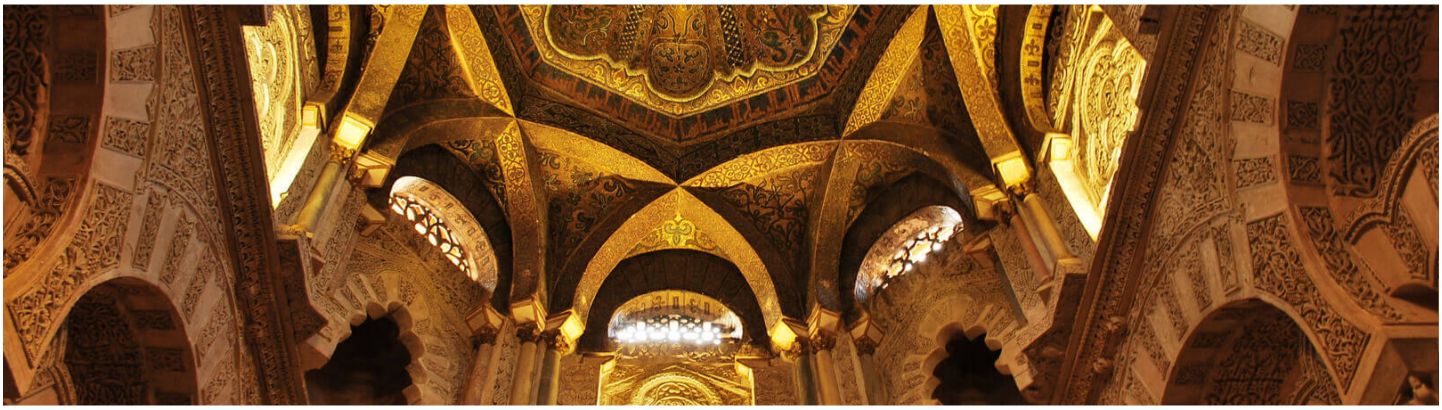

# সাহিত্য চর্চায় রাসূল সা. ও সাহাবীদের ভূমিকা

**ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ**

বাংলায় আমরা যাকে সাহিত্য বলি, আরবিতে তা □আল-আদাব□। তবে □আদাব□ শব্দটি □সাহিত্য□ থেকে ব্যাপক অর্থবোধক। সাহিত্য বলতে যদি বুদ্ধিবৃত্তি ও আবেগ-অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটায় এমন শিল্পোৎকর্ষ চমৎকার কথামালা বুঝায়, তাহলে □আদাব□ দ্বারাও তা বুঝায়। তবে □আদাব□-এর মধ্যে অতিরিক্ত কিছু ভাবও রয়েছে। আর তা হলোঃ শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, নৈতিকতা ইত্যাদি। জাহিলী যুগের আরবি সাহিত্য □আদাব□ শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় না। তেমনিভাবে আল-কুরআনেও শব্দটি নেই। তবে এ অর্থের ভিন্ন শব্দ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) হাদিসে এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, তাঁর অনুপম কথামালা, বাচনভঙ্গি, শব্দচয়ন, উন্নতমানের আচার-আচরণ, আদব-অভ্যাস, চাল-চলন ইত্যাদি দেখে সাহাবীরা অবাক বিস্ময়ে জানতে চাইলেন, আপনি এসব কোথা থেকে লাভ করেছেন? জবাবে তিনি বলেনঃ ১ আমার রব, আমার প্রভু আমাকে এ আদব শিখিয়েছেন। সুতরাং তিনি আমাকে সুন্দরভাবেই শিখিয়েছেন। এখানে শব্দটি শিক্ষাদান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) আরেকটি বাণীতে এসেছেঃ ২ □পৃথিবীতে এই কুরআন হলো আল্লাহর শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমাবেশ স্থল। সুতরাং এ সমাবেশ স্থল থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।□

হযরত □আলীর (রাঃ) একটি বাণীতে শব্দটির ব্যবহার এসেছেঃ □আমাদের বনু উমাইয়্যা ভাইয়েরা হলেন খাদ্য-খাবারের দিকে আহবানকারী।□ এখানে খাদ্য-খাবার সজ্জিত দস্তরখানের দিকে আহবানকারী বুঝানো হয়েছে।

শব্দটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবীদের যুগে পরিচিত ছিল। তবে আধুনিক যুগে যে অর্থে শব্দটি ব্যবহার দেখা যায়, তখন এ অর্থে ব্যবহৃত হতো না। পরবর্তী দেড়শ□ বছর পর্যন্ত শব্দটির অর্থের বিবর্তন ঘটতে থাকে। হিজরী দ্বিতীয় শতকের পরবর্তী সময় থেকে শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, উন্নত নৈতিকতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। আধুনিককালেও শব্দটি এসব অর্থে ব্যবহার হয়। তবে সাহাবীদের ভূমিকা হিসেবে □আদাব□ এখন সর্বজন স্বীকৃত পরিভাষা।

সাহিত্যচর্চায় সাহাবীদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে ইসলাম-পূর্ব আরবের সাহিত্য ও সাহিত্যচর্চার অবস্থা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। সাহিত্যকে সাধারণভাবে দুভাগে ভাগ করা হয়। গদ্য ও পদ্য। ছন্দ ও অন্ত্যমিলের ভিত্তিতে বিন্যস্ত নয় এমন শিল্প-মান-সম্পন্ন কথাকে গদ্য বলে। আর যাতে ছন্দ ও অন্ত্যমিল থাকে তাকে পদ্য বলে। জহিলী যুগের আরবরা রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক কাজকর্মে লেখার ব্যবহার করেছে। আল-জাহিক বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাদের রাজনৈতিক চুক্তিসমূহ লিখে রাখত। আর এই লিখিত চুক্তিসমূহকে তারা আল মাহরিক বলত।৪ কবি আল-হারিছ ইবন হিল্লিযা (হি.পৃ. ২৪/খৃ. ৫৮০)-এর মু□আল্লাকায় এই □আল-মাহরিক□-এর উল্লেখ দেখা যায়।৫ তবে কোনোভাবেই তারা এই গণ্ডির বাইরে নির্ভেজাল সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্যে আসেনি। সেই লেখা ছিল অতি সাধারণ ও সাদামাটা মানের। তাতে সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য পূরণ হতো। আর পূরণ হবার পর তাদের লেখাও শেষ হয়ে যেত।৬ তবে তাদের জন্যে যতটুকু দাবি করা যায় তাহলো তাদের যথেষ্ট □আমছাল□ (প্রবাদ-প্রবচন) আছে। তারা এর যথেষ্ট প্রয়োগ করেছে। আর এর পাশাপাশি তাদের ছিল খুতবা (বক্তৃতা-ভাষণ) দানের রীতি। এ কারণে তাদের অনেক খুতবা ছিল। জাহিলী আরবের আমছালের একটি অংশ অবিকৃত গ্রন্থবন্ধ হয়েছে। আর তাদের খুতবা তার অল্পকিছু ছাড়া প্রায় সবই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। সাহিত্যের অপর শাখাটি পদ্য। পদ্য বা কাব্যের ক্ষেত্রে তাদের খ্যাতি ছিল বিশ্বব্যাপী।

অলঙ্কারমণ্ডিত ভাষা ও বাগ্মিতায় জাহিলী আরব যে অতি উঁচু স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল, আর কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তার চিত্র পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা□আলা কাফিরদের পরিচয় দিতে গিয়ে এক স্থানে বলেছেনঃ৭ □আর এমন কিছু লোক আছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা আপনাকে চমৎকৃত করবে। আর সে সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে সে কঠিন ঝগড়াটে লোক।□

আল কুরআনের আরও আয়াতে তাদের ঝগড়া, বিতর্ক ও বাকপটুতার চিত্র ফুটে উঠেছে। যেমনঃ৮ □যদি তারা কথা বলে, আপনি তাদের কথা শুনুন।□৯ □অতঃপর যখন বিপদ কেটে যায় তখন তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরীতে অবতীর্ণ হয়।□১০ □তারা আপনার সামনে যে উদাহরণ উপস্থাপন করে তা কেবল বিতর্কের জন্যই করে। বস্তুত তারা হলো এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়।□

আল্লাহ তা□আলা আল কুরআনের পরিচয় দিয়েছেন বর্ণনা, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল গ্রন্থ বলে। এতে সবকিছু বিস্তারিত বর্ণনা করে সুন্দরভাবে বুঝানো হয়েছে। এ কারণে এর নামকরণ করা হয়েছে □আল ফুরকান□। আল্লাহ্ এর ভাষাকে আরাবিয়ুম মুবিন বা স্পষ্ট আরবি বলে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এই আল কুরআনের মতো এত উন্নতমানের ভাষা ও বর্ণনাশৈলীর গ্রন্থ যে জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল, নিশ্চয় তারা এর ভাষার সমঝদার ছিল এবং তাদের ভাষা ও বর্ণনা ক্ষমতাও উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল। একথা আল-জাহিজ (মৃ. ২৫৫/৮৬৯) বলেছেন।১১ কথাশিল্প ও বাগ্মিতায় তাদের যে প্রচণ্ড দখল ছিল, তার আরো একটি প্রমাণ যে, আল কুরআনের মোকাবিলা করার জন্য তাদেরকে আহবান জানানো হয়েছে।১২ আর এটাও তাদের চূড়ান্ত পর্যায়ের বাগ্মিতা ও বর্ণনা ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে। তেমনিভাবে শব্দ ও অর্থের মান ও গুরুত্বের পার্থক্য নিরূপণ এবং শব্দের ভাব-প্রকাশ ক্ষমতা কতটুকু তা যে তারা বুঝত, বিভিন্ন বর্ণনায় তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে, আল-ওয়ালীদ ইবন আল-মুগীরা ইসলামের একজন প্রবল শত্রু ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে আল-কুরআনের একটি আয়াতের তিলাওয়াত শুনে বলেছিলেনঃ১৩

> □আমি মুহাম্মদের নিকট কিছু কথা শুনেছি। তা না মানুষের কথা, না জ্বিনের। সে কথার আছে চমঃকার এক স্বাদ, আর তাতে আছে এমনই প্রাঞ্জলতা ও সৌন্দর্য, মনে হয় যেন এক ধরনের যাদু। তার উপরিভাগ যেমন ফলদায়ক, নিম্নভাগেও তেমনি প্রচুর পানীয়।□

আল-ওয়ালীদের এ মন্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, অলঙ্কারমণ্ডিত বিশুদ্ধ ভাষার তারা যেমন সমঝদার ছিল তেমনি সে ভাষায় তারা নিজেদের আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ও অভিব্যক্তিতেও সক্ষম ছিল।

বানু তামীমের একটি প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ও বক্তা আমর ইবন আল-আহ্তাম্মের ভাষণ শুনে তার বাকপটুতায় মুগ্ধ হয়ে রাসূল (সা) মন্তব্য করেনঃ১৪

□নিশ্চয় কিছু কিছু বয়ান ও বাগ্মিতায় যাদু আছে।□

মোট কথা, প্রত্যেক জাতির কোনো না কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবগত গুণ থাকে। যখন সেই জাতির কথা কোথাও আলোচনা হয় তখন মুহূর্তের মধ্যে সেই গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি মানুষের মন চলে যায়। আরবদের সম্পর্কে যখন কোনো আলোচনা হয় তখন সর্বপ্রথম তাদের যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা মানুষের মনে জাগে তা হলো ভাষার জোর ও বাগ্মিতা শক্তি। প্রাচীন আরব জাতি অন্য অনারব জাতি-গোষ্ঠীর প্রতি □আল-আজম□ শব্দটি ব্যবহার করতো। এর দ্বারা তারা অনারবদেরকে বোবা অথবা মনের ভাব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করতে অক্ষম বলে চিহ্নত করতো।১৫ এ থেকে অনুমান করা যায়, তাদের নিকট বাগ্মিতার স্থান কি ছিল এবং তা নিয়ে তাদের ছিল কি পরিমাণ গর্ব ও অহংকার।

ইসলাম-পূর্ব আমলের আরবরা ছিল একটি কাব্য-রসিক জাতি। তাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কবি ও কবিতার প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাদের নিকট কবির স্থান ছিল সবার উপরে। তারা কবি ও নবীকে একই কাতারের মানুষ বলে মনে করতো। তাইতো তারা রাসূলুল্লাহকে (সা) কবি বলে আখ্যায়িত করেছিল। ইবন রাশীক আল-কায়রোয়ানী (মৃ. ৪৫৬/১০৬৪) জাহিলী আরবে কবির স্থান ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ১৬

□আরবের কোনো গোত্রে যখন কোনো কবি প্রতিষ্ঠা লাভ করতেন তখন অন্যান্য গোত্রের লোকেরা এসে সেই গোত্রকে অভিনন্দন জানাতো। নানারকম খাদ্যদ্রব্য তৈরি করা হতো। বিয়ের অনুষ্ঠানের মতো মেয়েরা সমবেত হয়ে বাদ্য বাজাতো। পুরুষ ও শিশু-

কিশোররা এসে আনন্দ প্রকাশ করতো। এর কারণ, কবি তাদের মান-মর্যাদার রক্ষক, বংশের প্রতিরোধক এবং নাম ও খ্যাতির প্রচারক।

প্রাচীন আরবি সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায়, জাহিলী আরবে যেন কাব্যচর্চার প্লাবন বয়ে বলেছে। অসংখ্য কবির নাম পাওয়া যায় যা শুনেও শেষ করা যাবে না। ইবন কুতায়বা (মৃ. ২৭৬/৮৮৯) বলেছেঃ১৭

কবিরা- যারা কবিতার জন্যে তাদের সমাজে ও গোত্রে জাহিলী ও ইসলামী আমলে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন তাদের সংখ্যা এত বেশি যে কেউ তা শুমার করতে পারবে না।

তিনি আরও বলেছেঃ যারা কবিতা বলেনি- তাদের সংখ্যা খুবই কম। তাদের নাম যদি আমরা উল্লেখ করতে চাই তাহলে অধিকাংশ লোকের নাম উল্লেখ করতে পারবো।

রাসুলুল্লাহর (সা) খাদেম প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন: রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন আমাদের এখানে (মাদিনা) আসেন তখন আনসারদের প্রতিটি গৃহে কবিতা বলা হতো।

আরবদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির এমনি এক পর্যায়ে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটে এবং আর কুরআন অবতীর্ণ হয়। পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গেছে, তখন আরবি সাহিত্যের গদ্য ও পদ্য উভয় শাখায় ব্যাপক চর্চা হচ্ছিল। গদ্যের কোনো লিখিত রূপ না থাকলেও মৌখিক গদ্য তথা খুতবা (বক্তৃতা-ভাষণ) যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে এবং গোটা আরবে এর ব্যাপক চর্চা হতে থাকে। জাহিলী যুগের যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ইসলাম নতুনত্ব আনে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো কবিতা ও খুতবা। এ দুটি জাহিলী যুগেরই শিল্প। ইসলাম তা বহাল রেখে তার আরও উন্নতি ও ব্যপ্তি ঘটায়। এ যুগে দাওয়াতী কার্যক্রম, বিজয় অভিযান, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতিতে মুসলমাদের খুতবার বেশি প্রয়োজন থাকায় উন্নতির ক্ষেত্রে খুতবা কবিতাকে ডিঙিয়ে যায়। খুতবা তাদের নিকট বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। কারণ খুতবার প্রতি মানুষ বিরূপ হয়ে উঠতে পারে আল কুরআনে তেমন কোনো কথা আসেনি, যেমন এসেছে কবিতা ও কবিদের সম্পর্কে।১৮ জাহিলী যুগের লোকদের অতিমাত্রায় কবিতার প্রয়োজন থাকায় কবিকে খতীবের (বক্তা) ওপর গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিত। কিন্তু ইসলামী যুগে দাওয়াতী কাজের জন্যে, ব্যক্তি-সাহসকে জাগিয়ে তোলার জন্যে, বিভিন্ন দল ও মতের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে এবং শত্রুকে ভয় দেখানো ও বিতাড়নের জন্যে খুতবার বেশি প্রয়োজন হওয়ায় তাদের নিকট কবির চেয়ে খতীবের মর্যাদা বেড়ে যায়।১৯ সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে, জাহিলী যুগের তুলনায় ইসলামী যুগে খুতবা শুধু উৎকর্ষই হয়নি, বরং তা নতুন পথও পেয়ে যায়। ইসলাম খুতবার গুরুত্ব বাড়ানোর সাথে সাথে বিষয়বস্তু ও রীতি পদ্ধতিতেও নতুনত্ব আনে।

এর সাথে এ সত্যও স্বীকৃত যে, সকল চিন্তা ও ধর্মীয় আন্দোলন সব সময় খুতবার কাছে ঋণীই থেকে গেছে। বক্তাসুলভ বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী দাঈ (আহবানকারী) চিন্তা ও ধর্মের জগতে মাথার মুকুট হয়ে রয়েছেন। সকল নবী-রাসূল এবং সততা ও সত্যের দিকে সকল আহবানকারী নিজ নিজ মানুষের মান-মস্তিষ্ক প্রভাবিত করণের এবং সত্যের আওয়াজকে তাদের হৃদয়ের গভীরে পৌঁছানোর জন্যে সর্বদাই খুতবা ও বয়ানের প্রয়োগ করেছেন।

ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশমূলক সাপ্তাহিক ও বাৎসরিক তথা জুমআ, ঈদ ও হজ্জের খুতবা ছাড়াও এ যুগে অন্য যে সকল খুতবা আত্মপ্রকাশ করে তার মধ্যে জিহাদের খুতবা, বাহাছ-মুনাজারার খুতবা, বিজয়ের খুতবা এবং শোকজ্ঞাপক খুতবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক খুতবা, প্রতিনিধি মিশনের খুতবা ছাড়াও আরও এক প্রকার অতি গুরুত্বপূর্ণ খুতবার আত্মপ্রকাশ ঘটে এ যুগে, যাকে খিলাফত ও বিলায়ত-এর খুতবা নামে অভিহিত করা হয়। এটি হলো খলীফা নির্বাচনের পর জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত তাঁর প্রথম নীতি-নির্ধারণী ভাষণ। কোনো প্রাদেশিক শাসনকর্তার ভাষণও এর অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামী যুগের খতীবদের (বক্তা) সংখ্যা এত বেশি যে, খুতবার ইতিহাসের অন্য কোনো যুগের আধিক্যের সাথে তুলনীয় নয়। এ সকল খতীবের ইমাম হলেন সায়্যিদুল মুতাকাল্লিমীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)। কিয়ামতের দিনও তিনি হবেন আম্বিয়ায়ে কিরামের খতীব।২০ তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধভাষী মানুষ। তাঁর ভাষার শুদ্ধতা ও সাবলীলতায় বিস্মিত হয়ে সাহাবীগণ প্রশ্ন করতেন: আপনি এ ভাষা ও বর্ণনা জ্ঞান বিভাবে অর্জন করলেন? জবাবে রসূল (সা) বলতেন: আমি কুরায়েশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছি এবং বানু সাঈদে লালিত পালিত হয়েছি। তাঁর ভাষা জ্ঞান এত প্রখর ছিল যে, কোথায় এবং কখন কিরূপ শব্দ ব্যবহার করা উচিত এবং উচিত নয় তাও বলে দিতেন। তাঁর পরের স্থানে হলেন খতীবদের বিরাট একটি দল। তাদের মধ্যে প্রথম হলেন আলী ইবন আবী তালিব (রা)। তারপর আবু কবর, উমার ও উসমানের (রা) নামগুলো আসে। আবুল হাসান আ-মাদাইনী বলেন:২১

আবু বকর খতীব ছিলেন, উমার খতীব ছিলেন এবং উসমানও খতীব ছিলেন, আলী ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খতীব। এভাবে এ যুগে অসংখ্য তুখোড় খতীবের নাম ও তাদের খুতবা আরবি সাহিত্যের প্রাচীন সংকলনসমূহে দেখা যায়। পুরুষ খতীবদের পাশাপাশি অসংখ্য মহিলা খতীবের নামও পাওয়া যায়। যেমন উম্মুল মুমিনীন আইশা (রা), উম্মুল খায়র আল-বারকিয়্যা, আয-যারকা বিন্ত হাদী, ইকরাশা বিন্ত আল-আতরাশ (রা) ও আরও অনেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, জাহিলী যুগে কোনো লিখিত গদ্য ছিল না। ইসলামী যুগে শিক্ষার প্রসার হওয়ার এবং প্রয়োজনের তাগিদে পত্র-সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়। এ পত্র-সাহিত্যের সূচনা করেন রাসূল (সা)। পরবর্তীকালে খলীফাগণ, প্রাদেশিক শাসকর্তা ও সেনাবাহিনীর কমান্ডারগণ নানা ধরনের পত্রের আদান-প্রদান করেছেন, এসব পত্রেরও একটা সাহিত্য মান ও মূল্য আছে।

কবিতা ছিল জাহিলী আরববাসীর ভূষণ। সে যুগে আরবি কবিতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। ইসলামী যুগেও এ ধারা অব্যাহত থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে কবি ছিলেন না। তবে তিনি কবিতা শুনেছেন, আবৃত্তি করেছেন কবিদেরকে উৎসাহ এবং মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি একটি সুন্দর কবিতার আবৃত্তি শুনে মন্তব্য করেনঃ কোনো কোনো বাগ্মীতায় যাদু রয়েছে। আর কোনো কবিতায় রয়েছে জ্ঞান বা হিমাতের কথা। একদা শারীদ ছাকাফী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাহনের পেছনে আরোহী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কাছে উমিয়্যার কবিতা শুনতে চাইলেন। তিনি আবৃত্তি করছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ (সা) তাকেঁ আরও শোনাতে বলছিলেন। তিনি সেদিন মোট একশটি শ্লোক শুনেছিলেন। এ কথা সকলের জানা, কুরায়শদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরাত করেন। এরপরই এ শহরের অধিবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। একদিকে ছিল মক্কার কুরায়শ ও তাদের সহযোগী অন্যান্য আরব গোত্র। আর অপর দিকে ছিলেন নির্যাতিত রাসূল (সা) ও মদিনার আনসার ও মুনসার এবং মহাজিরগণ। এ যুদ্ধের অস্ত্রধারী যোদ্ধাদের পাশাপাশি উভয় পক্ষের কবিরা কবিতার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

ইসলামী-পূর্ব যুগে কুরায়শ গোত্রের উল্লেখযোগ্য কোনো কবি না থাকলেও ইসলামের সাথে সংঘর্ষের যুগে তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান, আবদুল্লাহ ইবন আয-যিবারী, দারার ইবন খাত্তাব আল ফিহরী, আবু ইজ্জাহ আল-জামহী হুবায়রাহ মাখযুমী প্রমুখ কবি প্রতিভাব প্রকাশ ঘটে। তারা সকলে ইসলাম-বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা তাদের কবিতার দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা), আনসার ও মুহাজিরদের গোত্র, ব্যক্তি চরিত্র ও ইসলামের নিন্দা ও কুৎসা বর্ণনা করতে থাকে। এটা মদিনাবাসীদের জন্যে কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমানদের কুৎসা রচনা করতো শুধু এ কারণে নয়; তারা তাদের রচিত দ্বারা অন্যন্য গোত্রে ইসলামের প্রচার কার্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো, এ জন্যেও। একদিন অতিষ্ঠ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) মদিনার আনসারদেরকে লক্ষ্য করে বলেন: যারা হাতিয়ার দ্বারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে সাহায্য করছে, জিহবা দ্বারা সাহায্য করতে কে তাদেরকে বাধা দিয়েছে? এ কথা শুনে হাসসান ইবনে ছাবিত বলেন: আমি এর জন্যে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমিও তো কুরাইশ বংশের। তুমি কিভাবে তাদের নিন্দা করবে? উত্তরে তিনি বলেন, মথিত আটা থেকে চুল যেভাবে বের করে আনা হয় আমিও তদ্রূপ আপনাকে বের করে আনবো। তার জন্যে মসজিদে নববীতে একটি মিম্বর স্থাপন করা হয়। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে স্বরচিত কবিতা আবৃতি করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তার কবিতা শুনে বলতেন, আমার পক্ষ থেকে জবাব দাও। হে আল্লাহ রুহুল কুদ্দুসকে দিয়ে তার সাহায্য করো। আর রাসূল (সা) তাকে এ কথাও বলেন যে, তুমি আবু বকরের নিকট গিয়ে কুরায়শেদের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বল দিকগুলি জেনে নাও। এ সম্পর্কে আবু বকরই অধিক জ্ঞানী। সত্যিই সেদিন হাসসান এ কাজের উপযুক্ত ছিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এ ক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, তার এ কবিতা তাদের জন্যে তীরের আঘাতের চেয়েও তীব্রতার। এসব কারণেই তিনি সঙ্গতভাবেই শাইরুর রাসূল বা রাসূলের কবি নামে খ্যাতি লাভ করেছেন। এ কবিতার সংর্ঘষে অপর যে দুজন কবি তাকে সাহায্য করেন, তারা হলেন, কাব ইবন মালিক ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা। সীরাতে ইবনে হিশাম পাঠ করলে কবিতার ও লড়াইয়ের একটা চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

ইসলামী সাহিত্যের ইতিহাসে কবি কাব ইবন যুহায়রের ঘটনাটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইসলাম শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি যে কত উদার ও এর কত বড় পৃষ্ঠপোষক এ ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। জাহেলী ও ইসলামী যুগের বিশিষ্ট কবি কাব ইবন যুহায়র। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলাম ও ইসলামের নবীর নিন্দামূলক কবিতা রচনা করে রাসূলের বিরাগবাজন হন। রাসূল (সা) তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। সে ব্যক্তিই যখন ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় এলেন এবং তার বিখ্যাত কাসিদা বানত বানত সুআদ আবৃত্তি করে রাসূলকে (সা) শোনান, তখন রাসূল (সা) তাকে শুধু ক্ষমাই করেননি; বরং খুশির আতিশয্যে তার সৃষ্টির প্রতিদান স্বরূপ নিজ দেহের চাদরটি তাকে উপহার দনে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশে নাদর ইবন হারিজকে হত্যা করা হয়। এরপর তার কন্যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে একটি মর্মস্পর্শী কবিতা আবৃত্তি করে। তা শুনে, তিনি বলেন, যদি এ কবিতা নাদরের হত্যার পূর্বে শুনতাম তাহলে তাকে হত্যা করতাম না। তুফায়ল ইবন আমর আদ-দাওসী রাসূলুল্লাহ (সা) এর

খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং বলেন: আমি একজন কবি, আমার কিছু কবিতা শুনুন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে তার কবিতা আবৃত্তি করতে বলেন। অতঃপর তিনি একটি দীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা) ধৈর্যসহকারে তা শোনেন। কবিতার জ্ঞানে রাসূল (সা) ছিলেন পারদর্শী। তিনি অনেক কবির কবিতা সংশোধন করে দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর তাঁর সুযোগ্য খলীফাগণ ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এ যুগেও কবিতাচর্চায় তেমন ভাটা পড়েনি। খুলাফায়ে রাশিদীন সর্বদাই কবিতা আবৃত্তি করতেন। আর রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীরা তো মসজিদে নববীতে কবিতা আবৃত্তির আসর বসাতেন।২২ ইসলামী যুগে যে সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় তাতে উভয় পক্ষে অসংখ্য কবি অংশগ্রহণ করেন এবং নিজ নিজ পক্ষের শৌর্য-বীর্যের বর্ণনা ও শত্রুর উদ্দেশ্যে নিন্দামূলক কবিতা রচনা করেন। খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রত্যেকে কবি ছিলেন। সা‌ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব বলেন:২৩

আবু বকর (রা) কবি ছিলেন। উমার (রা) কবি ছিলেন। আর আলী (রা) ছিলেন তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি। সে যুগের সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করলে হযরত আবু বকরকে (রা) একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক রূপে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি কবি নাবিগা আয-যুবইয়ানীকে জাহিলী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মনে করতেন এবং বলতেন: তার কবিতা শিল্পকুশলতা ও ছন্দ মাধুর্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা বেশি সাবলীল।২৪ দ্বিতীয় খলীফা উমার (রা) সম্পর্কে তো প্রসিদ্ধি আছে, কোনো প্রতিনিধিদল তার কাছে এলে তিনি তাদের কবিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। তারা তাদের কবিদের কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতো এবং তিনি নিজেও কোনো কোনো সময় সেসব কবিতার কিছু অংশ আবৃত্তি করতেন। তিনি বসরার শানকর্তা আবু মূসা আল-আশআরীকে (রা) নির্দেশ দেন:

তুমি তোমার ওখানকার লোকদেরকে কবিতা শেখার নির্দেশ দাও। কারণ, কবিতার মাধ্যমে উন্নত নৈতিকতা, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং বংশ এস্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। তিনি আরও বলতেন:২৫ তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাঁতার ও তীর চালনা শেখাও। তাদেরকে ঘোড়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দাও। আর তাদেরকে সুন্দর কবিতা বলে শোনাও। ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী (মৃ.হি.২৩২) বলেন, তিনি যে কোনো ধরনের ঘটনা বা ব্যাপারের সম্মুখীন হলেই সে সম্পর্কে কবিতার দুএকটি পংক্তির উদ্ধৃতি দিতেন।২৬ আরবি সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে তাকে সে যুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য-সমালোচক গণ্য করা হয়েছে। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি রুচির ভিত্তিতে নয়, বরং যুক্তির ভিত্তিতে সমালোচনা করেছেন, কবি যুহায়রকে তিনি সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মনে করতেন। শুধু এ সিদ্ধান্ত দিয়েই ক্ষান্ত হননি, সঙ্গে তার কারণও বলে দিয়েছেন। যুহায়রকে তিনি বলতেন:২৭ তিনি এক কথার মধ্যে আরেক কথা গুলিয়ে ফেলতেন না। জংলি ও আশোভন কথাও এড়িয়ে চলতেন। কোনো ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান গুণেরই তিনি প্রশংসা করেছেন। তার কবিতায় কোনো অতিরঞ্জন নেই। তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি এবং তার সঙ্গীসাথীরা সমবেত হয়ে কবিতা ও কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং কার কোন কবিতা সর্বোৎকৃষ্ট সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতেন।২৮ তিনি বলতেন, কবিতা হলো কোনো জাতির এমনই এক জ্ঞান যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোনো জ্ঞান নেই। (আল উমদা: ১-৯)

উমার (রা) কুরআনের আয়াতের অর্থ বুঝতে কবিতার শরণাপন্ন হতেন। একবার তিনি মিম্বরে ওপর দাঁড়িয়ে সূরা আন-নাহলের ৪৭তম আয়াত পাঠ করেন। তারপর উপস্থিত সাহারায়ে কিরামের নিকট আয়াতে উল্লেখিত তাকাউয়ুফিন শব্দটির অর্থ জানতে চান। সাহাবায়ে কিরাম সকলে চুপ থাকলেন। তখন হুযায়ন গোত্রের এক বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে বলল: হে আমীরুল মুমিনীন! এটা আমাদের উপভাষা। এর অর্থ অল্প-অল্প নেওয়া। উমার (রা) বৃদ্ধের নিকট জানতে চাইলেন, আরবরা কি তাদের কবিতা থেকে অর্থ জানতে পারে? অথ্যাৎ আরব কবিরা তাদের কবিতায় এ অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন? বৃদ্ধ বললেন, হ্যাঁ আমাদের কবি আবু কাবীর আল-হুযালী তার উষ্ট্রীর বর্ণনা দিতে গিয়ে একটি শ্লোকে এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তারপর বৃদ্ধ শ্লোকটি আবৃত্তি করে শোনান। উমার (রা) তখন বলেনঃ তোমরা তোমাদের দীওয়ান সংরক্ষণ করে রাখো, তাহলে তোমরা আর গোমরাহ্ হবে না।২৯ ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী (রা) ছিলেন জ্ঞানের ভাণ্ডার। সে যুগের আরব কবিদের মধ্যে তিনিও একজন শ্রেষ্ঠ কবি। দিওয়ানে আলী, নামক কাব্য সংকলন গ্রন্থটি আজও তার কাব্য প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে তার অবদান এ ভাষা যতদিন বেঁচে থাকবে, মানুষের নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি ছিলেন আরবি সাহিত্যের একজন সমঝদার সমালোচক। কেবলমাত্র সাহিত্যিক-সৌন্দর্য ও ভাষার অভিনবত্বের কারণে তিনি জাহিলী যুগের ভোগবাদী কবি ইমরুল কায়সকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে মনে করতেন।৩০

একবার যিয়াদ তার এক ছেলেকে আমীর মুআবিয়ার (রা) নিকট পাঠালেন। মুআবিয়া তার জ্ঞান-গরীমা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাকে অনেক প্রশ্ন করলেন। দেখলেন, ছেলেটির সব বিষয়ে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে। সবশেষে তিনি তাকে কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে বলেন। এবার ছেলেটি অক্ষমতা প্রকাশ করল। তখন মুআবিয়া (রা) যিয়াদকে লিখলেন : তুমি তোমার ছেলেকে কবিতা শেখাওনি কেন? কবিতা শিখলে সে অবাধ্য থাকলে বাধ্য হবে, কৃপণ তাকলে দাতা হবে এবং ভীরু থাকলে সাহসী হয়ে যুদ্ধে

যাবে।৩১ রাসূলুল্লাহর (সা) খলীফাগণ ছাড়াও অন্যান্য সাহাবীরা কবিতা চর্চা করতেন। নিজেরা কবিতা শিখতেন এবং অন্যদেরকে শেখার নির্দেশ দিতেন। হযরত আইশা (রা) বলেন: তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে কবিতা শিক্ষা দেবে। এতে তাদের ভাষার আড়ষ্টতা দূর হয়ে সহজ সাবলীল হবে।৩২ তার অসংখ্য কবিতা মুখস্থ ছিল এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে আবৃত্তি করতেন। এমন কি রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের এমন কাউকেও পাওয়া মুশকিল যিনি কোনো কবিতা রচনা করেননি, অথবা কখনো কবিতা আবৃত্তি করেননি।৩৩ হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস বলতেন, পবিত্র কুরআন পাঠ করে যদি কোথাও বুঝতে না পারো তাহলে তার অর্থ আরবদের কবিতার মাঝে সন্ধান করো।৩৪ এভাবে যদি সে যুগের আরবি সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে সাহিত্যে চর্চার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। মূলত সাহাবায়ে কিরামের দুই আদর্শ ছিল আল কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা) সুন্নাহ। এ দুটির ভিত্তিতে যেমন তারা জীবন পরিচালনা করেছেন, তেমনিভাবে এ দুটির আলোকে তারা সাহিত্য চর্চাও করেছেন। তাদের সার্বিক সর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে সাহিত্যচর্চার ব্যাপারে কোথাও তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় না। বরং ব্যপকভাবে তারা এ কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

তথ্য সূত্র

১. আহমাদ শায়িব, উসূল আন-নাকদ আ-আদাবী, পৃ.৪ ২. ইবনুল আছীর, আন-নিহায়া, (আদব) ৩. প্রাগুক্ত ৪. আল-জাহিজ, কিতাবুল হাওয়ান, ১/৬৯ ৫. দিওয়ানু শির আল-হারিছ ইবন হিল্লীযা, পৃ.২০ ৬. মাসাদির আশ-শির আল-জাহিলী, পৃ. ২৩-৫৮ ৭. আল কুরআন, ২:২০৪ ৮. প্রগুক্ত, ৬৩:৪ ৯. প্রগুক্ত, ৩৩:১৯ ১০. প্রাগুক্ত, ৪৩:৫৮ ১১. আল-জাহিজ, আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, ১/৮ ১২. আল কুরআন, ১০:৩৮; ১১:১৩; ১৭:৮৮ ১৩. আস-যামাখশারী, আল-কাশশাফ, ৪/৬৪৯; ড. শাওকী দায়ফ, আল-বালাগা: তাতাওর তারীখ, পৃ. ৯; মুহাম্মাদ আলী আস-সাবুনী, আত-তিবয়ান ফী উলূম আল কুরআন, ১০২,১০৩ ১৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, ১/৫৩ ৩৪৯; আবু ইসহাক আল-হাসারী, সাহরুল আদাব, ১/৫ ১৫. আল-বায়ান, ৪/২৭; ড. জহুর আহমাদ আজহার, ফাসাহাতে নাবাবী, পৃ. ৯৮ ১৬. ইবন রাশীক, কিতাবুল উমদা, ১/৭৮ ১৭. ইবন কুতায়বা, আশ-শিরু ওয়াশ-শুআরা; পৃ. ৩ ১৮. আল কুরআন, ২৬:২২৪ ১৯. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, ২/৯৮; জুরজী যায়দান, তারীখু আদাব আল-লুগাহ্ আল-আরাবিয়্যাহ, ১/১৮৭ ২০. মুসনাদে আহমাদ, ৫/১৩৭-১৩৮ ২১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, ১/৩৫৩ ২২. ড. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব, ২/৪৫ ২৩. ইবন আবদি বাব্বিহি, আল-ইকদ আল-ফারীদ, ৫/২৮৩ ২৪. ড. আবদুল মুনইম খাফাজী, মুকদ্দিমা: নাকদ আশ-শির, পৃ. ২৩ ২৫. আ-উমদা, ১/১০; হুসন আস-সাহাব, ১০/২২ ২৬.আল-আকদ আল-ফারদী, ৫/২৮১ ২৭. ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী, তাবাকাত আশ-শূআরা পৃ. ২৯; আল-বাকিল্লানী, ইজাস আল কুরআন, পৃ.১৩৪ ২৮. মুকদ্দিমা: নাকদ আশ-শির, পৃ. ২৩ ২৯. ইবন মানসুর, লিসান আ-আরাব-২/১৯৯২; তাজ আল-আরূস, ৬/১০৬ ৩০. মুকাদ্দিমা : নাকদ আশ-শির, পৃ. ২৩ ৩১. আল-ইকদ আল-ফারীদ, ৫/২৭৪ ৩২. প্রাগুক্ত ৫/২৭৪. ৬/৭ ৩৩. প্রাগুক্ত-৫/২৮৩; জুরজী যায়দান-১/১৯২ ৩৪. জুরজী যায়দান-১৯২

সূত্রঃ সংস্কৃতিঃ জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন ২০০৪ স্মারক গ্রন্থ।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ